২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন দেখতে ক্লিক করুন

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা: আলোকিত ভবিষ্যতের পথে বাংলাদেশের যাত্রা

লেখা: বদরুজ্জামান খোকন, তাইওয়ান

প্রকাশ: ০৪ নভেম্বর ২০২৪, ১৪: ০০

প্রথম আলো ফাইল ছবি

১.

আমার ছেলে আয়ানের বয়স তখন ৩ বছর ১১ মাস। তাইওয়ানের প্রি-স্কুলের ছাত্র। স্কুল থেকে এ সপ্তাহের বই দিয়েছে। এটি নিয়মিত ঘটনা। প্রতি শুক্রবার স্কুল থেকে একটি করে বই দেওয়া হয়। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোয় (শনি-রোববার) বইটি যেন পড়ানো হয়। অনেকটা বলা যায় মা-বাবার জন্য বাড়ির কাজ। আমার স্ত্রী তৃশা বইটি হাতে নিয়ে নড়েচড়ে দেখল। সে নিজেও বাংলাদেশের একটি পাবলিক ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক। বইটি কিছুক্ষণ উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে ভ্রু কুচকে বলল,

এ ধরনের বই তো আমাদের দেশে হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়।

স্কুল থেকে যেহেতু দিয়েছে, পড়াতেই হবে। তাই আয়ানকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করল,

চাঁদ আলো কোথায় থেকে পায়, জানো?

আয়ান ঝটপট উত্তর দিয়ে দিলো,

ওর (চাঁদ) তো লাইট (আলো) নেই। ও তো সান থেকে লাইট পায়!

তৃশা টাস্কি খেয়ে জিজ্ঞাসা করল,

তোমাকে এটা কে বলেছে?

আয়ানের ঝটপট উত্তর,

স্কুলে টিচার শিখিয়েছে! মুনের তো লাইট নেই। সান থেকে লাইট মুনে আসে।

আয়ানের উত্তর শোনে আমরা দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম। তার মানে, স্কুলে ইতিমধ্যে পড়ানো হয়ে গিয়েছে!! আমি বইটি হাতে নিলাম। তারপর সব কটি পাতা চায়নিজ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম। দেখলাম, কী নেই এখানে! চাঁদে আলো কোথায় থেকে আসে, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, জোয়ার ভাটা থেকে শুরু করে রকেট, মানুষের চাঁদে অভিযান পর্যন্ত আছে। ছবি আর গল্পের মাধ্যমে সবকিছু চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। শিশুরাও সহজে গ্রহণ করতে পারবে! কি চমৎকার শিক্ষা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের হাইস্কুলে পড়ুয়া অনেক ছেলেমেয়েও এ বইয়ের অনেক কিছুর উত্তর দিতে পারবে না।

ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠাতা হো চি মিনের উন্নয়নের সঠিক পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। শিক্ষা সম্পর্কে তার একটি উক্তি অনলাইনে পড়েছিলাম, '১০ বছরের উপকারের জন্য, আমাদের অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে। শত বছরের কল্যাণের জন্য, আমাদের অবশ্যই জনগণকে সুশিক্ষিত করতে হবে।' আসলেই তা-ই করা হচ্ছে। পাঁচ ধাপের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভিয়েতনাম ধারুন সফলতা পাচ্ছে। ফলে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়শই আন্তর্জাতিক পত্রিকায় খবরের শিরোনাম হয়। কিছুদিন আগে একটি ব্রিটিশ পত্রিকার শিরোনাম ছিল এ রকম, 'ভিয়েতনামের শিক্ষাব্যবস্থা এত ভালো কেন?' শিক্ষা একটি জাতির কি পরিবর্তন আনতে পারে, ভিয়েতনাম তার একটি উদাহরণ। শুধু খবরের পাতায় পড়েছি বলে লিখছি না। আমার ল্যাবে দুটো ভিয়েতনামিজ মেয়ে পিএচডি করছেন। ওদের দেখে সহজেই বুঝতে পারি, ওদের শিক্ষাব্যবস্থার আসল চিত্র। অথচ মাত্র এক যুগ আগেও ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের বাংলাদেশের মতোই ছিল। চরম দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর দেখা মিলত দেশের আনাচকানাচে। কৃষিকাজ, টেক্সটাইল আর পর্যটন। এই ছিল আয়ের পথ। এখন দিন বদলেছে। ছেলেমেয়েরা সমভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা রপ্তানি করছে তৈরি পোশাক থেকে টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্টস। অচিরেই তারা হতে যাচ্ছে

টেকনোলজির নতুন হাব। নতুন শিক্ষিত কর্মক্ষম জনশক্তির হাত তাদের অর্থনীতি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই এক দশকেই বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গিয়েছে বহুগুণ। এটি বোঝার জন্য দুটো ছোট তথ্য দেই। ভিয়েতনামের বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ ৩৭১ বিলিয়ন ডলার আর বাংলাদেশের প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার। যেখানে আমরা ২৩ বিলিয়ন রিজার্ভ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, সেখানে ভিয়েতনামের রিজার্ভের পরিমাণ ১০৫ বিলিয়ন ডলার!

দেশের মুল মেরুদণ্ড বলি আর মস্তিষ্ক বলি, ওটা একমাত্র শিক্ষা আর গবেষণাই। উন্নত দেশগুলো ঠিক এ জায়গাতেই জোর দিচ্ছে। ফলাফলও পাচ্ছে হাতেনাতে। তারা দিনের পর দিন এখানে বিনিয়োগ করছে। তার ফল বিক্রি করছে সারা বিশ্বে। আর আমরা? শিক্ষা খাতে তেমন বিনিয়োগ নেই। গত বছর সংবাদে পড়েছিলাম বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য (২০২২-২৩) সালে উচ্চশিক্ষায় গবেষণা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। খুবই নগণ্য পরিমাণ একটি বরাদ্দ! অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন একাই ইভিএম কেনার জন্য বাজেট চূড়ান্ত করছিল ৮ হাজার ৭১১ কোটি টাকা! যা বাংলাদেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮ বছরের গবেষণা বাজেটের সমান! আই রিপিট, ৫৮ বছরের সমান! যদিও রাজনৈতিক বাস্তবতা কিংবা অর্থনীতিক সমস্যার কারণে ইভিএম কেনার জন্য শেষমেশ এতগুলো টাকা আর বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

প্রথম আলো ফাইল ছবি

২.

প্রতিবছর পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে ভারত স্থান পায়। এমনকি পাকিস্তানের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসে। কিন্তু আমাদের সেরা ৮০০-এর তালিকায় স্থান হয় না। অনেকগুলো কারণের

ভেতর একটি বড় সমস্যা, গবেষণার বাজেটের স্বল্পতা। এ খাতে বাংলাদেশের বরাদ্দ একেবারেই অল্প। এটা এতটাই কম যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট খাতে অন্ততপক্ষে ৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে, এমন ৯০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত নেই! অথচ পাকিস্তান ঠিকই আছে। এমনকি আছে আফ্রিকার সুদান, উগান্ডা, ইথিওপিয়ার নাম পর্যন্ত! গবেষণা বাজেটের পাশাপাশি আরেকটি কারণ অদক্ষ বা অযোগ্য শিক্ষকের ছড়াছড়ি। কয়েক বছর আগে একবার পত্রিকায় পড়েছিলাম পিএইচডি থিসিস জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম লুৎফুল কবীরের পিএইচডি ডিগ্রি বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে পদাবনতি দেওয়া হয়েছে। সোজা কথায় উনার পিএচডি ডিগ্রি অর্জন করার যোগ্যতা ছিল না। তাই চুরি করে ডিগ্রিটি নিয়েছেন! অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে বললে উনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারও যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত হয়েছেন!

আমাদের দেশই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে উপযুক্ত যোগ্যতাকেই অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়! আমাদের দেশে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যাদের স্বপ্ন অনার্স শেষ করে বিদেশের নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে মাস্টার্স এবং পিএচডি সম্পূর্ণ করা। দেশে রিসার্চ ফান্ডিংয়ের অভাব। তাই সম্ভব হলে কিছুদিন নামকরা কোনো ল্যাবে পোস্টডক হিসেবে গবেষণায় যুক্ত থাকা। তারপর দেশে ফিরে এই জ্ঞান কাজে লাগানো। সমস্যা হলো, কেউ যদি একবার বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যায়, তার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা মোটামুটিভাবে বন্ধই করে দেওয়া হয়। কীভাবে? আমাদের দেশে অনার্স সম্পূর্ণ হতে বয়স প্রায় ২৫-২৬ এমনকি ২৭ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কেউ যদি বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করে, তত দিনে বয়স আর তিরিশের কোটায় থাকে না। পিএইচডি ডিগ্রিকে আমাদের দেশে সহজলভ্য মনে হলেও উন্নত দেশে তা ভিন্ন ব্যাপার। বেশ কঠিন, একই সঙ্গে অনিশ্চিত যাত্রার পথ! এ অনিশ্চিত ব্যাপারটি আবার কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর থাকে না। পুরোপুরি নির্ভর করে দেশ/ইউনিভার্সিটি/অধ্যাপকের ওপর। সাধারণত, ভালো মানের গবেষণাসহ পিএইচডি সম্পূর্ণ করতে চার থেকে সাত বছর পর্যন্ত লেগে যায়। এই পিএচডির মতো মহারণে জয়ী হওয়ার পর আরও স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য শুরু হয় পোস্টডক হিসেবে যাত্রা। এ মাস্টার্স, পিএচডি এবং পোস্টডক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমেই একজন পরিপূর্ণ গবেষক হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককের মূল যোগ্যতা হলো গবেষণার সাফল্য। কারণ, তিনি প্রথমত একজন গবেষক তারপর শিক্ষক। ঠিক এ কারণেই যেকোনো জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে তারাই মূলত সামনে থেকে পথ দেখাতে পারেন। তাদের নিত্যনতুন গবেষণার ফলাফল/নতুন আবিষ্কার ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সফার হয়। আর এই শিক্ষকের অধীনে কাজ করার মাধ্যমে মাস্টার্স/পিএইচডি ছাত্রছাত্রী কিংবা পোস্টডক গবেষক, এ পুরো প্রসেসটা হাতেকলমে শিখার সুযোগ পায়। তাই ধরেই নেওয়া যায়, একজন পরিপূর্ণ গবেষক হতে চাইলে বয়স কোনো নির্দিষ্ট কোটায় আটকে রাখা সম্ভব নয়।

সমস্যা হলো, আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশির ভাগ নিয়োগ হয় প্রভাষক হিসেবে। তাতে শর্ত হিসেবে থাকে সরকারি চাকরিতে যোগদানের ৩০ বছর বয়সের বিধান! ফলে যারা বিদেশে পড়াশোনা আর গবেষণা

করে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে, তারা সুযোগ পায় না। অথবা সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদের দূরে সরিয়ে রেখে বরং নিয়োগ দেওয়া হয় সদ্য অনার্স পাস অথবা মাস্টার্স পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের! মোটকথা, যারা এখনো নিজেরাই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রায় সমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের জীবন গড়ে দেওয়ার! ফলে লুৎফুল কবীরের পিএইচডি জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। ক্যাম্পাসগুলোয় রাজনীতির বাম্পার ফলন হয়। অথচ পরিকল্পিতভাবে দেশের ফাইনেস্ট ব্রেনগুলোকে ফিরিয়ে এনে রাতারাতি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-আধা সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বদলিয়ে ফেলা সম্ভব।

৩.

পরিকল্পিত রিভার্স ব্রেন ড্রেইন একটা দেশে কি পরিমাণ পজিটিভ প্রভাব ফেলতে পারে, তার চমৎকার একটি উদাহরণ হতে পারে চীন। অনেকগুলো দেশের যৌথভাবে তৈরি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে চীনের প্রবেশাধিকার ছিল না! ছিল না মানে, তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি! সেই চীনই এখন নিজস্ব মহাকাশ স্টেশনের মালিক, এবং তারা এই কাজটি করেছে সম্পূর্ণ একা! এটা কি ভাবা যায়? চীনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা। তবু তাদের অনেক গ্র্যাজুয়েট বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা ল্যাবগুলোয় ছড়িয়ে রয়েছে, জ্ঞান আহরণ করছে। প্রয়োজনে চীন সেই মেধাবীদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে চালু করেছে ‘Thousand Talents Program (TTP)’ বা ‘Overseas High-Level Talent Recruitment Program!’ প্রযুক্তি স্থানান্তরের এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে? আমার মনে আছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। তার দাবি, চীন আমেরিকার প্রযুক্তি চুরি করছে। কীভাবে? ট্রাম্পের দেওয়া ব্যখ্যা মিথ্যা ছিল না! তবে আসল সত্য হলো, শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন এক জিনিস, যা ইচ্ছা থাকলে অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান বিশ্ব অনেক উন্মুক্ত। তবে সেই ইচ্ছা হতে হবে আন্তরিক। চীনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। বাস্তবতা হলো, চীনা গবেষক ছাড়া উন্নত দেশগুলোর অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্যত অচল। এমনকি আমেরিকাতেও! চীনা বিজ্ঞানীরা নাসাতে কাজ করছে, ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠানে আছে। মোটকথা, আমেরিকার সব প্রেস্টিজিয়াস বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আর তারা সেখানে গিয়েছে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেই। চীন যে কাজটি করছে, তা হলো এই মেধাবীদের ফিরিয়ে নিয়ে দেশে একই রকম পরিবেশ প্রদান করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, এই মেধা চীনের কাজে লাগছে। হ্যাঁ, চীন এ কাজটিই করছে এবং এর ফলও আসছে হাতেনাতে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ ছিল! সেই চীন আজ শিক্ষা, গবেষণা এবং সামরিক সব দিক থেকেই দ্রুত বিশ্বের শীর্ষস্থান দখলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী ভারত কিছুটা এলোমেলো হলেও একই পথে হাঁটছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা ল্যাবগুলোয় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। আমার ধারণা, আগামী দশকের ভারত হবে অনেক বেশি শক্তিশালী। এর প্রধান কারণ তাদের খনিজ সম্পদ নয় বরং তাদের নীরব শিক্ষা বিপ্লব।

আমাদের দেশের জন্য কি এমন কোনো পরিকল্পনা আছে? আমরা কি ঠিক করতে পেরেছি ভবিষ্যতের বাংলাদেশে শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে? শিক্ষার উন্নতি ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই নয়। তাই আগামী নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হোক যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাদেশ গড়া।

***লেখক:** বদরুজ্জামান খোকন, পোস্টডক্টরাল রিসার্চার, ভাইরাল ভ্যাকসিন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ন্যাশনাল হেলথ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, তাইওয়ান

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো